**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
**A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 163 - 172
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

# শিবশঙ্কর মিত্রের সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাস : নিম্নবর্গের মানুষ ও বন্যপ্রাণীর দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের আখ্যান

ড. রিঙ্কি চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়
Email ID : rinki.bristi@gmail.com

***Received Date*** *16. 06. 2024*
***Selection Date*** *20. 07. 2024*

***Keyword***
*Subaltern, Sunderban, Marginalized sections, Socio-economic condition, Class-divided society, Class struggle, Conflict, Wild animal.*

***Abstract***
*Sivashankar Mitra's book 'Sunderban Samagra' focuses on the five novels 'Sunderban'er Arjan Sardar', 'Sunderban', 'Bede Baule', 'Bana Bibi', and 'Royal Bengaler Atmokotha' discusses the dialectical relationship between the terrestrial wildlife of the Sunderban region, especially the Sunderban's tiger and the subaltern people. The main aim of the essay is to gain a deep understanding of the daily struggles that have been a part and parcel of the lives of the people of Sunderbans, for the past several years; as brought to life in the above mentioned novels. This essay analyses the first three of the five novels.*

*Partha Chatterjee's discussion of 'Nimnavarg'er Itihas-charcha'r Itihas' suggests that Italian communist leader and philosopher Antonio Gramsci first used the term 'subaltern' in his famous 'Prison Notebooks'. Gramsci used the term 'subaltern' ('subalterno' in Italian) as a synonym in two situations. Firstly, the 'subaltern class' in a capitalist society is the working class. The second being - in any class-divided society, anyone oppressed by the 'dominant' class is a part of 'subaltern' class. The equivalent of 'subaltern' in the context of Bengali society, as suggested by Ranjit Guha, is 'Nimnavarga'. The social relationship is tied to a particular structure of dominance and subordination. The 'dominant' aristocracy rules over the helpless, the 'Nimnavarga'. The Nimnavarga thus entails the deprived farmers, workers, landless people, in addition to the marginalized sections of the society.*

*The sustinence people of the Sunderban region, a product of this social structure, includes the Mauals, Bawalis, Molangis, Gharamis, Majhi-Mallas, Gunins and others engaged in agriculture and fishing. The Nimnavarga of coastal Sunderbans survive as free scavengers; evidently in the pursuit of livelihood. Every step must be taken with*

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 20*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 163 - 172*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

*caution for any miscalculation can result in the loss of a limb or life. The love for their motherland, the desire to know and thrive in the Sunderbans is passed on through the generations; often superceding the struggles of a life here. This conflict of the coastal Nimnavarga with wildlife is reflected in their social behavior.*

*Unfortunately, our socio-economic infrastructure perpetuates this dialectical relationship. The forest, despite its dangers, is a symbol of strength to them, thus garnering tremendous respect for the goddess of the forest, 'Bana Bibi'. Perhaps the very will to survive and thrive amidst all adversaries is what proves Man to be a worthy opponent to Wildlife of the Bada region. Such day-to-day stories of not backing down find their mention in these three novels.*

---

**Discussion**

"তবু জেনো আরো এক মৃত্যুদীপ্ত মানে
ছিল এই ভূখন্ডের
ছিল এই সাগরের পাহাড়ের
দেবতার মনে।
সেই অর্থ লাঞ্ছিত যে, তাই
আমাদের সীমা হ'ল
দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে তরাই।"[1]

'শিবশঙ্কর মিত্রে'র (১৯০৯ খ্রি – ১৯৯২ খ্রি) 'সুন্দরবন সমগ্র' (১৯৮৬ খ্রি) গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা 'প্রেমেন্দ্র মিত্রে'র 'ভৌগোলিক' কবিতার এই অংশবিশেষ থেকেই আমাদের সুন্দরবন অঞ্চল সম্পর্কে অল্প হলেও ধারণা জন্মায়। সেই ধারণার মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে ঐতিহাসিক-ভয়ঙ্কর-বৈচিত্র্যেভরা-সৌন্দর্যময় এক কল্পভূমির চেতনা। একই সঙ্গে সেখানকার মানুষের নিদারুণ কষ্টের জীবন আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন লেখক পরম আন্তরিকতায়। 'বেদে বাউলে' উপন্যাসের শুরুতে লেখকের আত্মকথন মূলক আলোচনায় সুন্দরবনের সঙ্গে লেখকের একাত্মতা সম্পর্কে জানতে যায় –

"আমার একাত্মবোধটা হঠাৎ একদিনে আসেনি। এসেছে সুন্দরবন ও ততোধিক সুন্দর উপকূলবাসী মানুষগুলির সঙ্গে সুদীর্ঘকালের যোগাযোগের ফলে। সেই ১৯২৮ সাল থেকে যখন আমি যৌবনে পদার্পণ করি। প্রথমেই বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিক। মনে কামনা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী সশস্ত্র এক সৈন্যদলের পরিচালনায় সুন্দরবনের পটভূমিকে কাজে লাগাতে হবে। পিতৃদেবের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' ও তাঁর মুখ থেকে শোনা সুন্দরবনের গল্পগুলি এই ব্যাপারে আমাকে কম প্রেরণা দেয়নি। তখন থেকেই সুন্দরবনের নদী-নালার রেখাচিত্র ও মানুষের ইতিবৃত্ত নিয়ে যেমন মেতে উঠি, তেমনি এই বনে ও এই অঞ্চলে আসা-যাওয়া শুরু করি। বৈপ্লবিক সংগ্রাম আমলে পলাতক জীবনে এই অঞ্চলের নদী-নালা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাই। তারপর দীর্ঘ আট বছর জেলে বন্দীদশায় কাটে। কারাবাসের প্রথমেই পিতৃদেবের তিরোধান হয়। মৃত্যুর আগে সংসারের অন্ন সংস্থানের জন্য খাস সুন্দরবনবেষ্টিত এক খন্ড জমি সংগ্রহ করেন। দীর্ঘ কারাবাসের পর এই জমিখন্ড পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব যেমন আসে, তেমনি আমার জীবনে এক মহাসুযোগ আসে সুন্দরবনের চাষিদের সংস্রবে আসা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 163 - 172
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> এবং তাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে একত্রে বসবাস করার। এই সম্পর্ক নিবিড়তর হয় তাদের সঙ্গে একত্রে তে-ভাগা আন্দোলনে মেতে ওঠাতে।"[২]

এ ভূমির প্রতি মানুষের টান প্রবল। লেখকের মন্তব্য–

> "সুন্দরবন। নামটি লোকে সাধে দেয়নি। ভারি সুন্দর দেখতে এই বন। পাহাড়ি বনের মত বড়ো বড়ো গাছ না থাকলে কি হবে, ছোটো ছোটো গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সার বেধে। দেখলে মনে হয়, কেউ বুঝি তার এই বিশাল বাগান সাজিয়ে রেখেছে। ঝোপঝাড় বিশষে নেই বললেই হয়। তবে মাথার উপর ঘন পাতার ছাতা গোটা বনকে ছায়ার আবরণে ঢেকে রেখেছে। দিনের বেলায় বনতলে আলো-ছায়ার খেলা, রাতে ঘুটঘুটে আঁধারে ভীষণ জীব-জানোয়ারের আনাগোনা।"[৩]

অগুণতি নদ-নদী, সতেজ সবুজ অসংখ্য গাছ আর চলমান জলধারা এই বিশাল বনানীকে করে তুলেছে সুন্দর, জীবন্ত ও মায়াবী।

> "জীবনে ভরপুর এই বন জীয়নকাঠির মত যেন মানুষকে জাগিয়ে তোলে। এর ধারে কাছে গেলে কারও থির থাকবার উপায় নেই। বন যেন ডাকতে থাকে তার গহনে ছুটে যাবার ইসারায়। মোহ জাগে বনচারীর মনে। তাই সুন্দরবন এতো সুন্দর।"[৪]

জোয়ার-ভাঁটার টানা পোড়েনে এখানে ভাগীরথীর মিষ্টি জল আর সাগরের নোনা জলের মিশ্রণ ঘটে। ফলে বৈচিত্র এখানকার গাছ-গাছালিতে। সুন্দরী, গরাণ, গর্জন, বাইন, গোল, গেঁয়ো, কেওড়া, হেঁতাল, তবলা, গামুর ইত্যাদি নানাধরণের গাছ এখানে দেখা যায়; যেমন বিচিত্র এদের গুণ তেমন অপরিহার্যতা। যেমন – সুন্দরী কাঠের নৌকা, চামড়া রঙ করতে গরাণের ছাল, গেঁয়ো কাঠের ঢোলোক-তবলা, বাংলার মাটির পুতুল রঙ করতে গর্জনের তেল, গোলপাতার ছাউনি – আরো কত কি! সুন্দরবন সময়কালে মধু যেন ঢেলে দেয়! সুন্দরবনের মাছ আম-বাঙালির চাহিদা মেটায়। এই সব মিলিয়ে বাংলাদেশের অপরিমেয় সম্পদের ধনাগার সুন্দরবন। এই ধনাগারকে 'আগল' দেয় "ভীষণাকার, অতুলনীয় সাহসী আর অভাবনীয় সামর্থ্যের অধিকারী এই গহন বনের 'রাজকীয় বাঙালি বাঘ'।"[৫]
আর আছে সর্পিল গতিতে বিষ-বান হানার বিষধর নানা সাপ, ভয়ানক অজগর। আর আচমকা আঘাতে ঘায়েল করতে - কুমীর-কামোটের মত ঘাতক।

> "এই আয়ত কানন শুধু ধন ও জীবের লালন করে না। লালন করে গোটা বাংলাদেশকে।"[৬]

এই বন শতপথে তার শিকড়ের জাল পেতে রক্ষা করে ভূমিকে, পরিবেশকে। এই ভৌগোলিক পরিবেশের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বন্যপ্রাণী ও নিম্নবর্গের মানুষদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের দিকটি।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস' বিষয়ক আলোচনায় জানা যায় ইতালির কমিউনিস্ট নেতা এবং দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭) তাঁর বিখ্যাত 'Prison Notebooks' বা কারাগারে নোটবই (১৯২৯-১৯৩৫) তে সাবলটার্ন শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন।

> "সাবলটার্ন (ইতালিয়তে 'সুবলতের্নো') শব্দটি গ্রামশি ব্যবহার করেছেন অন্তত দুটি অর্থে। একটি অর্থে এটি সরাসরিভাবে 'প্রলেটারিয়াটের'- প্রতিশব্দ। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় 'সাবলটার্ন শ্রেণি' হল শ্রমিকশ্রেণি।"[৭]

অন্য আরএকটি অর্থে - যেকোনো শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ক্ষমতা বিন্যাসে 'ডমিন্যান্ট' শ্রেণি বা প্রভুত্বের অধিকারী শ্রেণির বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী মানুষরাই 'সাবলটার্ন' শ্রেণি। গ্রামশি মূলত ইতালির দক্ষিণ অংশের অনুন্নত কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী – যারা অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া, তাদেরকে 'সাবল্টার্ন ক্লাসেস' বলে অভিহিত করেছেন।

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 20*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 163 - 172*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

> "ভারতবর্ষের সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে 'সাবলটার্ন' শ্রেণির ধারণাটিকে নতুনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। রণজিৎ গুহ এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন 'নিম্নবর্গ'। সাবলটার্ন স্টাডিজ নামক প্রবন্ধসঙ্কলনগুলিতে এবং জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে, ডেভিড হার্ডিম্যান, রণজিৎ গুহ, শাহিদ আমিন প্রমুখ ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে এই ধারণাটি ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রামশির ইঙ্গিতগুলিকে অনুসরণ করেই 'নিম্নবর্গ' ধারণাটির উদ্ভব। কিন্তু তার প্রয়োগ ও বিস্তার করা হয়েছে ভারতবর্ষের সমাজ-ইতিহাসের ক্ষেত্রে।"[৮]

ভারতের নিরিখে রণজিৎ গুহ তাঁর 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' বিষয়ক আলচনায় ইংরেজ শাসিত ভারতে যারা প্রভুশক্তির অধিকারী ছিল (প্রভু শ্রেণি আবার দেশি ও বিদেশী এই দুই ভাগে বিভক্ত), অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ভারতে যারা উচ্চবর্গের অন্তর্গত তাদের বাদ দিয়ে সবাইকেই নিম্নবর্গের বলে নির্দিষ্ট করেছেন। এর মধ্যে শহরের শ্রমিক ও গরীব মানুষ, সর্বোচ্চ পদের আমলা বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামের কৃষিজীবী মানুষ, গরিব চাষি, খেতমজুর, এরা সবাই নিম্নবর্গ। উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ শব্দ দুটি শাসকশ্রেণি ও শোসিতশ্রেণির প্রতিশব্দ রূপেও ব্যবহৃত হয় অনেক ক্ষেত্রে। বৈষম্যযুক্ত সমাজে এই যে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের ধারণার উদ্ভব; যেখানে ক্ষমতাই হল মূল কথা সেখানে প্রভুত্ব ও অধীনতার এক বিশেষ কাঠামোয় সামাজিক সম্পর্কটি বাঁধা থাকে। এই সামাজিক সম্পর্কে 'ডমিন্যান্ট শ্রেণি' তথা শাসক তথা অভিজাতশ্রেণির অধীনস্ত অসহায়- বঞ্চিত কৃষক, শ্রমিক, ভূমিহীণ মানুষ, প্রান্তিক মানুষ ছাড়াও জাতি, গোষ্ঠী, নারী, লিঙ্গ, পেশা, বয়স, বর্ণ, ইত্যাদির নিরিখে সকলেই যারা সামাজিক স্তর-বিন্যাসে আধিপত্যবাদী ক্ষমতার বিপরীত মেরুতে অবস্থিত তারা সকলেই নিম্নবর্গ।

বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষদের উজ্জ্বল উপস্থিতির ধারা বহমান। আমাদের আলোচ্য 'শিবশঙ্কর মিত্রে'র 'সুন্দরবন সমগ্র' তে যে সকল নিম্নবর্গের মানুষদের দেখা যায় তারা সকলেই সুন্দরবন অঞ্চলের ভূমিপুত্র নয়। ইংরেজরা ভারতে আসার পর এই অঞ্চলকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক করে তোলার প্রয়োজনে প্রথমেই তারা সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর জঙ্গলকে ইজারা দিয়ে পরোক্ষে হাসিল করার লক্ষে জমিদারদের ব্যবহার করেছিল। দায়িত্ব পেয়ে জমিদারেরা আড়কাঠি বা অন্যান্য মধ্যস্ত্বভোগী মানুষদের সাহায্যে মেদিনীপুর, ছোটনাগপুর, রাঁচি, হাজারীবাগ, ময়ূরভঞ্জ ইত্যাদি জায়গা থেকে আদিবাসী কর্মঠ শ্রমিকদের নিয়ে এসেছিল সুন্দরবন অঞ্চলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে। উচ্চবর্গের মানুষের চক্রান্তে এই আদিবাসী শ্রমিকের আর ফিরে যেতে পারেনি তাদের নিজভূমে বরং বহু বঞ্চনা, ব্যথা, প্রতিবন্ধকতাকে সঙ্গে নিয়ে তারা সুন্দরবন অঞ্চলকে দ্বিতীয় জন্মভূমি মেনেই থেকে গিয়েছিল সেখানে। আর সুন্দরবনের জল-জঙ্গল-ভূমি হয়ে উঠেছিল তাদের জীবন-জীবিকা।

সুন্দরবন অঞ্চলের নিম্নবর্গের মানুষের জীবন-জীবিকা বা বৃত্তি মূলত জল-জঙ্গল এবং ভূমিকেন্দ্রিক। যেমন- মৌয়াল; এরা জঙ্গলের ভিতর থেকে ঘুরে ঘুরে মধু সংগ্রহ করে। বাওয়ালি – এরা জঙ্গল থেকে যারা গাছ, গোলপাতা সংগ্রহ করে ও বাঘ তাড়াবার কাজ করে। সুন্দরবনের প্রাচীনতম পেশা এটি। এছাড়া আছে কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, কাঁকড়া শিকারি, রেনু বা মীন শিকারি, ডিম শিকারি, ব্যাঙ শিকারি, ঘরামি, গুনিন বা সাঁইদার, মাঝি-মাল্লা। আর আছে চুনুরি- যারা শামুক থেকে চুন তৈরি করে। জোংরাখুটা-সমুদ্রের ঢেউ-এর ফেনা তীরে এসে যখন জমাট বেঁধে যায় তখন তাকে জোংরা বলে। তার থেকে চুন তৈরি হয়। এক শ্রেণির মানুষ এটি সংগ্রহ করে জীবন নির্বাহ করে। মোলঙ্গী- লবন তৈরি করার পাত্রকে মোলাঙ্গা বলে। সুন্দরবন অঞ্চলে লবন তৈরির সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের মোলঙ্গি বলে। কাগচি বা কাগজি- সুন্দরবনের জঙ্গলে একসময় কাগজ তৈরি হত, আর এই পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের কাগচি বা কাগজি বলা হয়। বাঁধালি- যারা পুকুর, ঘর, বাড়ি, বনানীর কোনো অংশকে মাটি দিয়ে বাঁধ দেয়। এছাড়া নিষিদ্ধ দুই পেশার কথা উল্লেখ করতেই হয় – দস্যুবৃত্তি আর পতিতাবৃত্তি। কালের নিয়মে সমাজের পরিস্থিতির পরিবর্তনের ঢেউ এসে লেগেছে সুন্দরবন অঞ্চলেও। ফলে এই অঞ্চলের নিম্নবর্গের মানুষের জীবিকাতেও এসেছে পরিবর্তন। আধুনিক যন্ত্রের আবিস্কারের ফলে সুন্দরবন অঞ্চলের চুন, লবন তৈরি পেশা লুপ্তপ্রায়। সুন্দরবনের কাগজ শিল্পের স্থান পরিবর্তন হয়েছে। সেই কারনে অল্প সংখ্যক মানুষ এইসব পেশায় টিকে আছে, বাকিরা পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলের "এই পারস্পরিক ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে মানুষের বেঁচে থাকার জিয়নকাঠি।"[৯]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 163 - 172
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সুন্দরবনের উপকূলবাসী নিম্নবর্গের মানুষেরা অরণ্যে বাস না করলেও তারা অবাধ বনচারী – অবশ্যই জীবিকার তাগিদে। জীবিকার উৎস এই বিশাল ধনাগার থেকে ধন আহরণ করতে গিয়ে প্রতি পদে তারা ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হয়। ভীষণ-ভয়ঙ্কর জীবজন্তুর আক্রমণে হয়; কখনও নিরুপায় মানুষগুলির অঙ্গহানি হয়, কখনও প্রাণ যায়। সুন্দরবন সম্পর্কে প্রবাদই আছে 'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ'। একথা সত্য হলেও তারা পিছপা হয়না। এই লড়াকু, সাহসী, তেজোময় উপকূলবাসীর জীবন সর্বদাই যেন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। জীবন-মৃত্যুর এই দ্বন্দ্ব সুন্দরবনের বৈশিষ্ট্যের অন্যতম।

অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যোগ্যতমের উদবর্তন- ডারউইনের এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে জীব-জগত এগিয়ে চলেছে এতো আমরা জানি। আমরা এও জানি যে তারতম্য থাকলেও জীবন–সংগ্রামের বহুমাত্রিকতায় দ্বন্দ বাদ দিয়ে সামগ্রিকভাবে জীবনকে বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তিক বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম, তা যেকোনো সুবিধাভোগী শ্রেণীর তুলনায় এতই কঠিন যে, তা সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত। শিবশঙ্কর মিত্রের 'সুন্দরবন সমগ্র' গ্রন্থ অবলম্বনে সুন্দরবন অঞ্চলের নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে বহু বছর ধরে চলে আসা প্রতিদিনের, প্রতিমুহূর্তের বহুমাত্রিক-কঠিন-কঠোর–লড়াই-সংগ্রামকে আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। লেখকের আলোচ্য গ্রন্থের সুন্দরবন-কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে বন্যপ্রাণী ও মানুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে জানা যায় যে সেখানে প্রতিপদে বিপদ লুকিয়ে রয়েছে মাটিতে ও জলে। যদিও এই প্রবন্ধের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে শিবশঙ্কর মিত্রের 'সুন্দরবন সমগ্র' গ্রন্থের সুনির্দিষ্ট তিনটি উপন্যাসে মূলত স্থলবাসী বন্যপ্রাণী - বিশেষত সুন্দরবনের বাঘ ও নিম্নবর্গের মানুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে।

শিবশঙ্কর মিত্রের 'সুন্দরবন সমগ্র' গ্রন্থের তিনটি উপন্যাস – 'সুন্দরবনের আর্জান সর্দার' (১৯৫৫), 'সুন্দরবন' (১৯৬২) ও 'বেদে বাউলে' (১৯৮৫)। এই তিনটি উপন্যাসে সুন্দরবন অঞ্চলের বন্যপ্রাণী ও নিম্নবর্গের মানুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে দেখা যায় উপকূলবাসীর টিকে থাকার অসম্ভব কঠিন লড়াইয়ে কখনও মানুষ জিতে যায়, আবার কখনও মানুষ পরাজিত হয়। তবু সুন্দরবনের উপকূলবাসী নিম্নবর্গের মানুষ হার মেনে এই লড়াই থেকে সরে যায় না। জীবনধারণের এ লড়াইকে তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যেভাবে লালন করে চলেছে; সেদিকে এবার নজর দেওয়া যেতে পারে।

লেখকের চোখে দেখা, খুব কাছ থেকে চেনা, সুন্দরবনের উপকূলবাসী একটি চরিত্র আর্জান সর্দার। তার জীবনকে কেন্দ্র করেই লেখা 'সুন্দরবনের আর্জান সর্দার' উপন্যাসটি। সংসারের দ্বায়িত্বসুত্রে লেখক খুলনা জেলার দক্ষিণের আবাদ অঞ্চলে তাদের পারিবারিক পতিত জমি আবিস্কার ও উদ্ধারের কাজে দুর্গম শ্বাপদসংকুল সুন্দরবন অঞ্চলে যখন আসেন তখন তাঁর সঙ্গে আর্জান সর্দারের পরিচয় হয় -

> "নৌকা করে গন্তব্যে আসতে বাঘের গর্জন, বুনো শূয়রের বিকট চিৎকার, প্রবল জলস্রোত, জোয়ারের বান পার করে লেখক দেখলেন– 'ছোট একটি মানুষ বনের ভিতর থেকে এগিয়ে এসে হাত ইশারা করে ডাকছে'।"[১০]

সেই শান্ত, দুর্জয় মানুষটির নাম আর্জান সর্দার। সে ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছে – "তার বা'জানকে বাঘে খেয়েছিল।"[১১] আর্জানের যখন দু'বছর বয়েস তখন তার 'বা'জান'-এর মৃত্যু হয়। তখন ফাল্গুন মাস, মাঠে কোনো কাজ ছিল না। তাই গরীব চাষি আর্জানের বাবা বনে মধু আনতে যায়। মধুর চাকের কাছে যেতে না যেতেই বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। টেনে হিঁচড়ে তাকে বনের মধ্যে নিয়ে চলে যায়। তবু ঐ অঞ্চলের সব মানুষের মত আর্জানেরও বনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। বনকে এদেশের মানুষ যেমন ভালবাসে, তেমন ভয়ও করে। সুন্দরবন অতি গভীর, অতি ভয়ঙ্কর – তবু বনে না গেলে এদেশের মানুষের জীবন চলে না। রান্নার কাঠ, খাওয়ার মাছ, বনের ভিতর থেকে গোলপাতা কেটে আনতে, হাটের খরচ তুলতে, হরিণের মাংস খাওয়ার লোভ – সবেতেই এদের বনে যেতে হয়। বাঘ, কুমির, সাপের মতো ভয়ঙ্কর বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে সবসময় খালি হাতে লড়াই করা যায়না। তাই এরা বন্দুক রাখে, জোগার করে – দেশি বন্দুক, গাদা বন্দুক, নিজেদের হাতে তৈরি করা বেপাশী বন্দুক।

বন, বাঘ, আর শিকার আর্জানের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে বুঝেই তার মা কলিমের মেয়ে ফতিমার সঙ্গে আর্জানের বিয়ের ঠিক করে। আর্জান আপত্তি করেনা, চাষির ছেলেরা অল্প বয়সেই বিয়ে করে। তার উপর কলিমের প্রতি

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 20*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 163 - 172*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

আর্জানের অসীম শ্রদ্ধা – কলিম ভয়ানক সাহসী, সে বাউল, মন্ত্র দিয়ে বাঘ তাড়ায়, বাঘের মুখ থেকে হরিণের মাংস ছিনিয়ে এনে মাংস খাওয়ার সখ মেটায়। বিয়ের পর কলিমের হাত ধরেই বাদার ছেলে আর্জানের বনের হাতে খড়ি আরম্ভ হয়। ধীরে ধীরে আর্জান সাবালক হয়, বন্দুকও জোগাড় করে, সঙ্গী মাদারের সাথে পরামর্শ করে বনে যায়, হরিণ শিকার করে। এমনি একদিন বাঘের ছোট্ট বাচ্চাকে আর্জান বন্দুকের গুলিতে ঘায়েল করে। ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত বাঘিনী সন্তানের হত্যাকারীকে খুঁজতে থাকে। ক্রমে বনে অন্ধকার নেমে আসে। আর্জান আর মাদার গাছেই অপেক্ষা করে। ক্লান্ত, ঘুমন্ত মাদার গাছ থেকে পড়ে যেতেই বাঘিনীর সন্তান হত্যার প্রতিশোধ পূর্ণ হয়।

সুন্দরবনের মানুষেরা হামেসাই বনে যায়, আর মাঝে মধ্যেই বাঘের মুখে মানুষ দিয়ে আসে। এখানকার রীতি অনুযায়ী বনে দল থেকে কাউকে বাঘে নিয়ে গেলে বাকিরা প্রমাণ আনার চেষ্টা করে। নাহলে লোকে বিশ্বাস করতে চায় না- বাঘে খেয়েছে না খুন হয়েছে। আর্জান মাদারের কোন প্রমাণ আনতে পারেনি। তাই কেউ তাকে ক্ষমা করেনি, একমাত্র কলিমের ক্ষমা সে পেয়েছিল। যদিও –

> "মাদারের মর্মান্তিক ঘটনাও ওরা একে একে ভুলে গেল। যেমন করে শহরের মানুষ ভুলে যায় কলেরার মৃত্যুকে। বনে কিছু মানুষের জীবন যে দিতে হবে, ওরা এটা ধরেই নেয়! এমন সংসার আবাদে একটিও মিলবে না, যাদের একজন না একজন বনে প্রাণ দেয়নি। এ যেন বনের সঙ্গে আবাদের মানুষের নিয়ত সংগ্রাম চলছে। বনের উপর কে আধিপত্য করবে তারই যেন যুদ্ধ। এ যুদ্ধে কখনও বা বনচারী মারা যায়, কখনও বা আবাদের মানুষ। দুজনেই করে জীবিকার সংগ্রাম।"[১২]

বন্যপ্রাণীর সঙ্গে আবাদের মানুষের এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মূলে আমাদের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর একটি বড় ভূমিকা আছে। যেমন– 'আর্জান সর্দার' উপন্যাসের আর্জানের জমি নেই, সে আধি বর্গাদার। ফসলের অর্ধেক তার পাওয়ার কথা কিন্তু সে পেত সিকি। শোষণের শিকার হয়ে তাও হাতছাড়া হল। তাই সে বেঁচে থাকার তাগিদেই বনে যেতে বাধ্য হয়– শুরু হল তার সমপুর্ণরূপে বন্যজীবন। রাত নেই, দিন নেই সে বনে বনে ঘোরে। সংসার চালাতে বনই তো ভারসা। কিন্তু বন বনাম সংসার এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব আর্জানকে ক্লান্ত করে দেয়। অন্নের কথা ভাবলে বনকে ভুলতে হয়, বনের কথা ভাবলে অন্নকে ভুলতে হয়। সে কোনটাকেই ভুলতে চায়না। মূলত হরিণ শিকার করেই সে সংসার চালায়। বনে অনেকবার বাঘের মুখোমুখি হয়েছে। কয়েকজন সঙ্গীকে বাঘে নিয়ে গেছে যেমন, তেমন সে বাঘও মেরেছে। বাঘ শিকার করে সে পুরস্কার পায়না কারণ তার বন্দুক বেপাশী। নায়েবের মাংস খাওয়ার লোভ হলে বেপাশী বন্দুক দিয়ে হরিণ শিকার করে একবার সে পুলিশের হাতে পড়ে। কলিমের হস্তক্ষেপে সেযাত্রা রক্ষা পায়। আবার বনের বাঘ লোকালয়ে ঢুকে মানুষ নিয়ে গেলে ফরেস্টবাবুরা কলিম বাউলের স্মরণাপন্ন হয়, তখন কলিম বাউলে আর্জানকে সঙ্গী করে নিয়ে যায়। ক্রমে আর্জানকে দক্ষ বাঘ শিকারি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে কলিম। নায়েব আর্জানকে ভিটে ছাড়া করলে কলিমই তাকে বনকর অফিসে দশটাকা মাইনের কাজ জোগাড় করে দেয়। বেশিদিন মন দিয়ে কাজ করতে পারেনা সে। কলেরায় কলিমের মৃত্যু তাকে অসহায় করে তোলে। ধনী চাষি হারেজের সাহায্যে সর্দারপাড়ায় অগ্রিম সেলামিতে ফতেমা ও ছেলে তুফোকে নিয়ে ঘর বাঁধে। শুরুতে জমানো টাকা ব্যয় করে বা বাঘের দাঁত, হাড় বেচে সংসার চালালেও তাও একদিন শেষ হয়। অভাবের ভরসা সেই বন। কিন্তু ফতেমা পণ করেছে আর্জানকে বন ছাড়া করবে। বন যেন চারিদিক থেকে আর্জানকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সুযোগ এসে যায়। ফরেস্ট অফিসার আর্জানকে ডেকে পাঠায় মানুষখেকো বাঘ মারার জন্য। অনেক চেষ্টা করেও আর্জান বাঘ মারতে ব্যর্থ হয়ে উপহাসের পাত্র হয়। দক্ষ বাঘ শিকারি আর্জান তখন পেটের দায়ে ভেড়িতে কাঁকড়া ধরে, মাছ ধরে, ভয়ঙ্কর সব সাপ মেরে মানুষের উপকার করে। ভেড়ির বাঁধ ভেঙে ঘর-গ্রাম ভেসে য়ায়, কুমিড়ের আক্রমণ থেকে কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে গেলেও তার কাজ চলে যায়। তবু জীবন সংগ্রামের এইসব কঠিন পরিস্থিতিতেও সে হার মানেনা। শেষবারের জন্য সে নিজেকে প্রমাণ করে, সে বাঘ মারে। বাঘ শিকারেই আপাত শান্ত আর্জান সর্দারের জয় ঘোষণা হয়। শেষপর্যন্ত তার এই জয়ে গর্বিত হয় ফতেমা। বাদা অঞ্চলে বন্যপ্রাণী ও মানুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে যে মানুষই শেষকথা; আর্জান তা জীবন দিয়ে প্রমাণ করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 163 - 172
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'সুন্দরবন' উপন্যাস গড়ে উঠেছে ছোটো ছোটো বিভিন্ন কাহিনীকে নিয়ে। যেখানে প্রতিটি কাহিনীতেই বাঘ শিকারে যাওয়া সুন্দরবনের মানুষের বাঘের শিকারে পরিণত হওয়ার কাহিনী। কোনো কাহিনীতে দেখা যায় উপকূলবাসীরা জীবন-জীবিকার জন্য অথবা বাঘ দেখার নেশায় অথবা বাঘ শিকারের নেশায় বনে যায় ও বাঘের আক্রমণের কবলে পড়ে বা বাঘের খাদ্যে পরিণত হয়। উপন্যাসের রহিম বাওয়ালির দশ বছরের মা-মরা মেয়ে মমতাজ বাবাকে পাখি ধরে এনে দেওয়ার আবদার করে। বাওয়ালির কাজ হল – বাঘ তাড়াবার কাজ। তাকে প্রায়ই বনে যেতে হয়। কাঠ, মধু, গোলপাতা কাটার দলের রক্ষক হয়ে বাওয়ালিদের সুন্দরবনে যাওয়া মানে – এক এক সময় একমাস, দু'মাস কাটিয়ে আসা। তাছাড়া সংসারের নিত্য প্রয়োজনে রহিমদের বনে যেতে হয়। এবারেও সে সঙ্গীদের সাথে জ্বালানির কাঠ আনার জন্য বনে যায়। মেয়ের ইচ্ছে পূরণ করতে গিয়ে বনে বাঘের আক্রমণের শিকার হয় যেমন সে, তেমন খালি হাতে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে, কাদায় আটকে পড়া বাঘকে কামড়ে দিয়ে প্রাণ নিয়ে সফল হয়ে ফিরে আসে।

নোনা জলের জোয়ারের সঙ্গে সুন্দরবনের চাষিদের লড়াইও খুব কঠিন। নদীকে বাঁধ দেওয়ার জন্য মাইলের পর মাইল ধরে তারা দল বেঁধে ভেড়ি তোলে তাও আবার বিনা পারিশ্রমিকে। 'লোনা বিষে' চকের মানুষ জর্জরিত হয়ে যায় সারা বছর। ফলে সংসার চালাতে বনে যেতে বাধ্য হয়। যেমন জয়নুদ্দি, ইসমাইল, মোড়ল – এরা সুন্দরী গাছ কাটতে বনে যায়। গাছ কেটে যখন ডিঙি বোঝাই করে তখন বিনামেঘে বজ্রপাতের মত বাঘ মোড়লকে কামড়ে ধরে নিয়ে চলে যায়। 'লোনা জলের দাপটে' যখন সংসারে দুর্দিন তখন স্ত্রী ফরিদার কথায় ফজল 'গুইসাপ' মারতে বনে যায়। কারণ-

> "গুইসাপের চামড়ার বেশ চড়া দাম। নানা শৌখিন জিনিস তৈরি হয় এতে। তারই সুযোগে আবাদের লোকে অবাধে গুইসাপ মারতে শুরু করে। সুন্দরবনে তা আছেও অজস্র। কিন্তু মারতে মারতে এমন অবস্থা যে, বনে সাপের উপদ্রব হয়ে ওঠে ভীষণ কেননা গুইসাপ সাপ-ভক্ষক। এদের দাপটে বিষাক্ত সাপেরাও সংযত থাকে।"[১৩]

অবশেষে সুন্দরবনে 'গুইসাপ' মারা বেআইনি ঘোষণা হলেও তলে তলে ব্যবসা চলে। দুর্লভ আর মাধোকে সঙ্গে নিয়ে ফজল গেল বনে গো-সাপ মারতে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।

> "তীর বেগে ছুটে এসে বিরাট মুখ-ব্যাদানে কামড়ে ধরল কোমর ও তলপেট। গোঁ গোঁ করে উঠেছে। এতো নিকটে বলেই হয়তো হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আবশ্যক হয়নি। উঁচু করে এক টানে নিয়ে চলল।"[১৪]

শিকার যার পেশা, শিকার যার নেশা, শিকার ছাড়া যার জঠর-অগ্নি শান্ত করার আর কোনও পথ নেই- সেও যেমন মত্ত; মত্ত বটে কিন্তু বাঘের এমন সংযত, নিঃশব্দ মত্ততার তুলনা নেই। 'সুন্দরবন' উপন্যাস জুড়ে তারই ছবি।

'বেদে বাউলে' উপন্যাসে যে অঞ্চলের কথা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, তার নাম 'বড়দল'। সুন্দরবনের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত এই গঞ্জ। সপ্তাহে একদিন – রবিবার এখানে হাট বসে। সেইদিন হাটে লাখো-লাখো টাকার কেনা-বেচা হয়। হাটে অনেক পাকা দোকানও আছে। এমনই এক কাপড়ের দোকানে সপ্তাহে তিন দিন কাজ করে ঊনিশ-বিশ বছরের কর্মঠ যুবক- অনিল। বনে-বাগানে-বিলে-মাঠে ঘুরে বেরানো তার স্বাভাব। মা তাকে আদর করে ডাকে– 'বেদে'। অনিলের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়, দোকানে রাখা একটি বন্দুক –

> "বন্দুক মানেই তো শুধু প্রাণ-হরণকারী যন্ত্র নয়। বনের রহস্যে আমোদিত হবার ভরসা যোগায় এই অস্ত্র। কাজেই এই বন্দুকই অনিলকে টেনে নিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত বনে – সুন্দরবনের বাদায়।"[১৫]

'মালিকের' ছেলে অবিনাশকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হল তাদের সুন্দরবন অভিযান। বনের দুই রক্ষক- বাঘ আর বনকর অফিসের ভয় ছিল, কেননা –

> "অঘোষিত ভাবে সুন্দরবন তো বাঘের রাজ্য; আর বন মানে তো শুধু বন আর বাঘ নয়, বন এক মহাসম্পদ, আর সে সম্পদের ঘোষিত রাজা হলেন বনকর অপিস।"[১৬]

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 20*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 163 - 172*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

তবু সুন্দরবনের উপকূলবাসী যুবক ভয়ের প্রথম ঝলকে সন্ত্রস্ত হলেও পিছপা হয়না। ধীরে ধীরে শিকারের নেশা পেয়ে ধরে ওদের। সাধ্য ও এক্তিয়ারের মধ্যে থেকেই অনিল হরিণ শিকার করে এনে বড়দলের স্থায়ী বাসীন্দাদের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আপ্যায়ন লাভ করে। এভাবে ভালোই দিন চলে যাচ্ছিল অনিলের কিন্তু কাল হল ১৯৫০ সালের খুলনার দাঙ্গা। বড়দলে দাঙ্গা না হলেও সেখানকার মানুষ দলে দলে ভিটে-মাটি ছেড়ে কলকাতামুখী হল। অনিল তার মাকে নিয়ে সেই দলেই ভিড়েছে। যতই তারা এগোতে থাকে ততই অনিল পিছুটান অনুভব করে –

> "বনই আমার ভরসা, - বন আছে, আর আছে আমার এই ডিঙ্গি— কে আমাকে জীবন যুদ্ধে হারাবে!"[১৭]

শেষপর্যন্ত অনিল মাকে নিয়ে কলকাতা না গিয়ে উল্টো পথ ধরল, ঠাঁই গড়ল গোসাবায়। বাদা অঞ্চলে ডিঙি আর বেপাশী বন্দুককে সঙ্গী করে আরম্ভ হল অনিলের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়; আরম্ভ হয় সুন্দরবনের বন্যপ্রাণীর সঙ্গে তার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের দিকটি। সহজ হয়ে আসা নতুন জীবনে তার মনের দুটি আবেগ কিছুতেই তাকে স্থির থাকতে দেয়না। ছেলেবেলার কবি-কবি ভাব থেকেই ভাটিয়ালি গানে প্রতিষ্ঠা পেতে চায় সে, আর অন্যদিকে শিকারের নেশা তাকে পাগল করে তোলে। একদিন গোসাবার ডাক্তারবাবু, বড় স্কুলের মাস্টার আর আরো অনেককে নিয়ে অনিল গেল সুধন্যখালিতে হরিণ শিকারে। সেখানে সে জীবনে প্রথমবার বাঘের সামনে পড়ল। সঙ্গীদের বাঘের আক্রমন থেকে বাঁচাতে সে বাঘকে হত্যা করে গোসাবা গঞ্জকে কাঁপিয়ে তুলল। মা জানতে চায় বেদে বাঘটাকে বিলাসবাবুর বন্দুক দিয়ে মেরেছে কিনা -

> "না মা, এতো বড়ো বাঘকে কি ঐ বন্দুকে অতো সহজে ঘায়েল করা সম্ভব। ভাগ্যি, দ্বিতীয় বার যখন বনের ভিতরে যাই, তখন ডাক্তারবাবু তাঁর রাইফেলটা আমার হাতে তুলে দেন।"[১৮]

সুন্দরবনের উঠতি বয়সের মানুষের কাছে অস্ত্রের প্রতি লোভ ও আকর্ষণ দুর্নিবার।

> "সুন্দরবনের মানুষের আছে অজস্র বে-আইনি বন্দুক। তারাও পারতপক্ষে সে-সব বন্দুক কখনও নিজেদের ঘরে রাখে না। বনের গভীরে রেখে দেয়। বেদেও তাই করেছে। নদীর ওপারে বনের বেশ গভীরে এক বানগাছের খোঁড়লে বন্দুকটা রেখেছে।"[১৯]

সেখান থেকে বন্দুক আনতে গিয়ে অনিল একবার কালকেউটের মুখ থেকে বেঁচে ফিরে আসে। বে-আইনি বন্দুক দিয়ে শিকারের নেশা অনিলকে পেয়ে বসলেও তার মধ্যে দ্বন্দ্ব কাজ করে। সিদ্ধান্ত নেয়, বিলাসবাবুর বন্দুক ফিরিয়ে দেবে। সেই উদ্দেশ্যে কলকাতায় যায়। তার সেকেলে মায়ের কাছে বে-আইনি বন্দুক রাখা মহাপাপ। ছেলের সিদ্ধান্তে মা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ডিঙি করে সুন্দরবন থেকে সুদূর কলকাতার 'বাঘবাজারে' বিলাসবাবুর বাড়ি এসে যখন অবশেষে বন্দুকের কথায় আসে তখন অনিল উত্তর পায় –

> "পাশ আমার কাছে এখনও আছে নাকি! থাকলেও সে পাশ তো পাকিস্তান সরকারের— ও বন্দুক তুমি তোমার করেই রেখে দাও, আমাকে ঝামেলায় ফেলো না। বুঝলে! কলকাতায় কি বাদা আছে?"[২০]

অনিল আনন্দে ভাবে- এখন থেকে বন্দুকের মালিক সে। কিছুতেই সে মানুষকে বাঘের খাদ্য হতে দেবে না। বন্দুক নিয়ে মোকাবিলা সে করবে। বাঘ কারো গায়ে যদি নখের আঁচড় বসায় তবে তার গায়ের চামড়া খুলে নেবে সে। কিন্তু পরক্ষণেই সচেতন হয়, বাদার মানুষ বনবিবির জীবের সঙ্গে হঠকারিতা করে না।

বন্যপ্রাণীর সঙ্গে সুন্দরবনের উপকূলবাসীর সম্পর্ক এমনই দ্বন্দ্বময়। বনের কোলের ছেলেরা যেন আপনা থেকেই তেজি হয়ে ওঠে। এরা বাঘ দেখলে কাঁপে না। কিন্তু ভাস্কর পন্ডিতের চরিত্রে অভিনয় করতে 'হাঁটু কাঁপে'। এমনটাই হয়েছিল অনিলের ক্ষেত্রে। অনিল একই সাথে শিল্পী ও শিকারি। তার শিল্পী সত্তা আর শিকারি সত্তা একাকার হয়ে যায় এই জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে। সুন্দরবনকে ভালোবাসে বলেই সুন্দরবনকে চেনার উদগ্র বাসনা এদের রক্তে। যে বাসনাকে তারা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সযত্নে সঞ্চারিত করে। যেমনটাই দেখা যায় অনিলকে করতে। মাংস খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে সে আসলে সবুরকে বাদা তথা সুন্দরবনকে চেনায়। সুন্দরবনের সঙ্গে লড়াইয়ে মোকাবিলা করতে শেখায়।

আলোচ্য উপন্যাসের আর একটি কঠিন বাস্তবের উল্লেখ- গোসাবার একটি অঞ্চল; নাম বিধবাপল্লী। চাপা বেদনার ব্যঞ্জনা থাকলেও সুন্দরবনের জীবন-যুদ্ধে লড়াকু জেলে মানুষের বিক্রম এই নামকরণের মূলে। মাছ ধরতে গিয়ে অন্যান্য ভয়ঙ্কর জীব জন্তু ছাড়াও বাঘের সঙ্গে এদের লড়াই খালি হাতে। সংসার ভাঙার মত এমন 'সব্বনেশে' অবস্থার সঙ্গে এখানকার জেলে-বধূরা বীরের মতো লড়াই করে। কখনও নিজেরা খেটে সংসার চালায়, ছেলে-মেয়ে মানুষ করে, কখনও আবার বিধবা-বিবাহ মেনে নিয়ে নতুন সংসার গড়ে। ঝড়, ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণি, বন্যা, খরা, কুমীর্, সাপ, বাঘের সঙ্গে যেমন সুন্দরবনের উপকূলবাসী লড়াই করে, তেমন এদের লড়াই মহাজন, দারিদ্র্য ও নানা বৈষম্যের বিরুদ্ধেও। এই প্রসঙ্গে বিধবাপল্লীর সঙ্গে বাউলের সম্পর্কের উল্লেখে বলা যায়- বাউলের বাবা মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের কামড়ে মারা যায়। তবু সুন্দরবনের অমোঘ আকর্ষণকে সে অস্বীকার করতে পারে না। চৈত্র মাসে ফুলপট্টির মধু খাওানোর জন্য বাউল বিধবাপল্লীর জনা পঁচিশ ছেলেদের নিয়ে গেল সুন্দরবনে। সেই ছেলেদের মধ্যে একজন ভজহরি। বাঘের হিংস্র আক্রমনে ভজহরি ক্ষত বিক্ষত হলেও লাঠির আঘাতে বাঘকে ঘায়েল করে। এই অভিজ্ঞতা তার প্রথম হলেও ভজহরি অকুতভয়। আসলে সুন্দরবনের আবহাওয়াতেই সংগ্রামের বীজমন্ত্র রয়েছ। সুন্দরবনের মানুষের তাই সংগ্রামী না হয়ে উপায় নেই। দীর্ঘ চিকিৎসার পর সুস্থ ভজহরিকে বিধবাপল্লীতে ফিরিয়ে দিয়ে বাউলে আক্ষেপ-মুক্ত হয়। বন্যপ্রাণীর সঙ্গে সংগ্রামের পাশাপাশি অন্য লড়াই-এর মোকাবিলা যে করে উপকূলবাসী, তার পরিচয়ও পাওয়া যায় উপন্যাসে -

> "মগ-ফিরিঙ্গিদের আমল থেকেই সুন্দরবনের ডাকাতির 'সুনাম' আছে। সে-আমলে তো ডাকাতি ও লুঠপাট নয়, যাকে পায় তাকেই ধরে নিয়ে যেতো, মেয়েদের পেলে তো কথাই ছিল না। নিয়ে গিয়ে গরু-ভেড়ার মতো তাদের বেচা-কেনা করতো মগ-ফিরিঙ্গিরা দেশ-বিদেশে। দাস-ব্যবসার অভিশাপ এমনি করেই নেমে আসে গোটা বাদা অঞ্চলে।"[২১]

দেশভাগ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, নকশাল আন্দোলন ইত্যাদি সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের নানা প্রভাব, উত্থান পতন বাউলের মতো সুন্দরবনের উপকূলবাসীদের জীবনকে প্রভাবিত করে। বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে লড়াই এর পাশাপাশি শাসকশ্রেণি, উচ্চবর্গের অত্যাচারী মানুষের সঙ্গেও অনবরত লড়াই করে চলা এদের জীবনের অঙ্গ।

১৯৭৫ সালে টাইগার প্রজেক্ট শুরু হয় সুন্দরবনে। শুধু বাঘ মারা নয়, বাঘ মারার পরিকল্পনা জানা গেলেও ভয়ঙ্কর শাস্তি। তাতে বাঘের মৃত্যু কম হলেও বাঘের হাতে মানুষ মরার ঘটনা বরং বেড়েই চলেছে - এর খবর প্রজেক্টে আসেনা। চাষি, জেলে, মৌলিদের মৃত্যুর খবর পেলে উল্টে তাদেরই দায়ী করা হয়– নিশ্চই তারা বাঘ মারতে জঙ্গলে গিয়েছিল, তাই জরিমানা দিতে হয়। তবু বনাঞ্চল ছেড়ে বাঘ যখন লোকালয়ে আসে তখন সুন্দরবনের মানুষ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। সুযোগ পেলেই বন্দুক ছাড়াই লাঠি, বল্লম দিয়ে সমবেতভাবে বাঘ মেরে কুপিয়ে মাটির তলায় পুঁতে দেয়, আর আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাঘের দামি চামড়া বিক্রী করে দেয়। এই ভয়াল প্রতিক্রিয়া তারা বেছে নিতে বাধ্য হয় বাঁচার জন্য। এই নৃশংসতার বিপরীত চিত্রও দেখা যায়। লোকালয়ে ঢোকা বাঘকে রক্ষা করতে তারা টাইগার প্রজেক্টের লোকেদের খবর দেয়। প্রজেক্টরবাবু আসেন, লোকলস্কর আসে, খাঁচা আসে, বন্দুক আসে, ঘুম পাড়ানি বুলেট আসে। সেই এলাহি আয়োজনের কেন্দ্রে দুটি প্রাণী – বাঘ আর বাউলে; দুই বিপরীত্মুখী শক্তির অধিকারী। দক্ষ-কুশলী শিকারি বাউলের দ্বারাই বাঘের প্রাণ রক্ষা হয়। জীবন-জীবিকার জন্য পরস্পরের পাশে না দাঁড়ালে দুর্গম বনের হিংস্র পশুর মুখোমুখি বাস করা দায়, সুন্দরবনের উপকূলবাসী মানুষ তা বোঝে। তাদের বেঁচে থাকার একটা বড় ভাবনা হল– প্রতিনিয়ত তাদের বাঘের সঙ্গে লড়াই করা অথবা বলা যেতে পারে বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচার উপায় খোঁজা। তবে অকারণে তারা বাঘ শিকার করে না। তারা জানে বনের রক্ষক বাঘ, আর বাঘের রক্ষক বন। বন্যপ্রানীর সঙ্গে উপকূলবাসী নিম্নবর্গের মানুষের এই দ্বন্দ্ব যে তাদের চেতনা ও সামাজিক আচরণে প্রতিফলিত হয় তা উল্লিখিত তিনটি উপন্যাস পাঠে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। আমাদের সমাজ-অর্থনীতি সুন্দরবনের নিম্নবর্গের মানুষকে এই দ্বন্দ্বময় জীবনকে বেছে নিতে বাধ্য করলেও টিকে থাকার বহুমুখী সংগ্রামে আজও তাদের সামাজিক অবস্থান আমাদের প্রতিনিয়ত প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়।

## Reference:

১. মিত্র শিবশঙ্কর, সুন্দরবন সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা ৯, ১ম সং ডিসেম্বর ১৯৮৮, দ্বাদশ মুদ্রণ জুলাই ২০২২, পৃ. ৭
২. তদেব, পৃ. ১৪
৩. তদেব, পৃ. ৯
৪. তদেব, পৃ. ৯
৫. তদেব, পৃ. ১০
৬. তদেব, পৃ. ১১
৭. ভদ্র গৌতম (সম্পা), নিম্নবর্গের ইতিহাস, প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মন্ডল রোড, কোলকাতা ২, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮, পৃ. ১৩
৮. ভদ্র গৌতম (সম্পা), নিম্নবর্গের ইতিহাস, প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মন্ডল রোড, কোলকাতা ২, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮, পৃ. ১৫
৯. মন্ডল রাকেশ, সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে মানুষের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম,সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, জীবন মন্ডল হাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ২০২১, পৃ. ২৫
১০. মিত্র শিবশঙ্কর, সুন্দরবন সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা ৯, ১ম সং ডিসেম্বর ১৯৮৮, দ্বাদশ মুদ্রণ জুলাই ২০২২, পৃ. ২২২
১১. তদেব, পৃ. ২২৫
১২. তদেব, পৃ. ২৪৪
১৩. তদেব, পৃ. ৩৪০
১৪. তদেব, পৃ. ৩৪২
১৫. তদেব, পৃ. ১৬
১৬. তদেব, পৃ. ১৭
১৭. তদেব, পৃ. ১৯
১৮. তদেব, পৃ. ২৮
১৯. তদেব, পৃ. ২৯
২০. তদেব, পৃ. ৪৩
২১. তদেব, পৃ. ৭৭

## Bibliography:

ভদ্র গৌতম (সম্পা), নিম্নবর্গের ইতিহাস, প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মন্ডল রোড, কোলকাতা ২, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮

মন্ডল রাকেশ, সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে মানুষের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম,সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, জীবন মন্ডল হাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ২০২১

মিত্র শিবশঙ্কর, সুন্দরবন সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা ৯, ১ম সং ডিসেম্বর ১৯৮৮, দ্বাদশ মুদ্রণ জুলাই ২০২২

সেনগুপ্ত সুধীন, সুন্দরবনের জীব পরিমন্ডল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা ৯, ১ম সং ডিসেম্বর ১৯৮৮, ১ম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৫

হোসেন মোঃ মোসারফ, সুন্দরবন বৈচিত্র্যের অপরনাম, দিব্য প্রকাশ, ৩৮/২ক বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০, ২য় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০০৯